MAYNAGURI COLLEGE

B. A. Minor 4th Semester

UHHSNM2002 - HISTORY

Study Material

CATEGORY - I / বিভাগ - ক

3x2 =06

১.এলাহাবাদ প্রশস্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

এলাহাবাদ প্রশস্তি (Allahabad Prasasti) বা প্রয়াগ প্রশস্তি হল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। এটি সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালীন সময়ে তাঁর সভাকবি ও মন্ত্রী হরিষেণ রচিত একটি প্রশস্তি (panegyric), যেখানে সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক ও সামরিক কৃতিত্ব, বিশেষ করে তাঁর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জয়যাত্রা, বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এলাহাবাদ প্রশস্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিম্নরূপ-

রাজনৈতিক ইতিহাসের উৎস: এটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস জানার প্রধান প্রামাণ্য দলিল। সমুদ্রগুপ্তের সামরিক অভিযান, জয়ী ও পরাজিত রাজাদের তালিকা, এবং তাঁর কূটনৈতিক নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়।

<u>প্রশস্তি রচনার ঐতিহ্য:</u> এটি প্রাচীন ভারতের রাজাদের গৌরবগাথা ও কীর্তি প্রচারের প্রশস্তি রচনার ঐতিহ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এতে কবিতার মাধ্যমে সম্রাটের গুণাবলি ও জয়গাথা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশাসন ও কূটনীতি: সমুদ্রগুপ্ত কেবল শক্তি প্রদর্শন করেই থেমে থাকেননি, বরং তিনি পরাজিত রাজাদের অনেককেই ক্ষমা করে পুনরায় তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং কিছু রাজ্য তাঁর আধিপত্য মেনে নেয়। এতে গুপ্ত প্রশাসন ও কূটনৈতিক কৌশলের পরিচয় মেলে।

সমাজ ও সংস্কৃতি: এই প্রশস্তি থেকে গুপ্ত যুগের ভাষা, সাহিত্য, শৈলী ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় রচিত, যা সে সময়ের সাহিত্যরুচি ও অভিজাত শ্রেণির মানসিকতা প্রতিফলিত করে।

সমসাময়িক ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা: প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের অধীনস্থ ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর নাম, তাদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে, যা ঐ সময়কার ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক চিত্র স্পষ্ট করে।

উপসংহার: এলাহাবাদ প্রশস্তি সমুদ্রগুপ্তের সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের অমূল্য দলিল এবং গুপ্ত যুগের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য উৎস।

২.হর্ষচরিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

হর্ষচরিত্র (Harshacharita) হল সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত কবি বাণভট্ট রচিত সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবনী। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং প্রাচীন ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

হর্ষচরিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবনের তথ্যসূত্র:
হর্ষচরিত্র থেকে হর্ষবর্ধনের জন্ম, পারিবারিক পটভূমি, রাজ্যাভিষেক, সাম্রাজ্য বিস্তার, প্রশাসন, দানশীলতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র:

এই গ্রন্থে হর্ষের সময়কার সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এতে রাজদরবার, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কৃষি, বাণিজ্য, নগরজীবন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ:

হর্ষচরিত্রে হর্ষের সামরিক অভিযান, বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক, যুদ্ধ, কূটনীতি ইত্যাদির উল্লেখ আছে, যা সেই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মূল্যবান দলিল।

সাহিত্যিক ও ভাষাগত গুরুত্ব:

এটি সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভাষার অলংকার, উপমা, বর্ণনা ইত্যাদির মাধ্যমে বাণভট্ট সমকালীন সাহিত্যরুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

অন্যান্য সূত্রের পরিপূরক:

হর্ষচরিত্র ছাড়াও চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ, শিলালিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি হর্ষের ইতিহাস জানার উৎস। তবে বাণভট্টের বর্ণনা ঐতিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি সাহিত্যিক অলংকারে সমৃদ্ধ, তাই তুলনামূলক বিচার জরুরি।

উপসংহার

হর্ষচরিত্র শুধু হর্ষবর্ধনের জীবনের নয়, বরং সপ্তম শতাব্দীর উত্তর ভারতের সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এক অমূল্য ও অপরিহার্য উৎস।

৩.ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

ফা-হিয়েন (Fa-Hien) ছিলেন চীনের বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পরিব্রাজক, যিনি খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীর শুরুতে (৪০৫-৪১১ খ্রিঃ) ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি মূলত বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ সংগ্রহ ও বৌদ্ধ ধর্মচর্চার প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে ভারত এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ফো-কুও-চি' (Record of the Buddhist Kingdoms) নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

সমসাময়িক ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য:
ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে গুপ্ত যুগের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, আইন, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, নগরজীবন, গ্রামীণ জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা:

তিনি ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত বৌদ্ধ কেন্দ্র যেমন নালন্দা, কুশীনগর, লুম্বিনী, কপিলাবস্তু, পাটলিপুত্র ইত্যাদি পরিদর্শন করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার, বৌদ্ধ বিহার, ভিক্ষুদের জীবনযাপন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির বর্ণনা দেন। এতে গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা ও বিস্তার সম্পর্কে জানা যায়।

প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা:

ফা-হিয়েন ভারতীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, শাস্তির বিধান, রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভারত ছিল শান্তিপূর্ণ, চুরি-ডাকাতি ছিল খুবই কম।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা:

তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, তৎকালীন ভারতে শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার উৎকর্ষ ছিল। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনার নিরপেক্ষ দলিল:

ফা-হিয়েন একজন বিদেশি পর্যবেক্ষক হিসেবে নিরপেক্ষভাবে তাঁর দেখা ভারতকে তুলে ধরেছেন, যা ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।

গুপ্ত যুগের স্বর্ণযুগ হিসেবে মূল্যায়ন:

তাঁর বিবরণে গুপ্ত যুগের শান্তি, সমৃদ্ধি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কথা উঠে এসেছে, যা এই যুগকে 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে।

উপসংহার:

ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণের বিবরণ গুপ্ত যুগের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, প্রশাসন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করে। তাঁর বিবরণ ছাড়া গুপ্ত যুগের অনেক দিক অজানা থেকে যেত। তাই ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ ভারতীয় ইতিহাসের এক অমূল্য উৎস।

৪.গুপ্ত যুগে গিল্ডের সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা:

গুপ্ত যুগ (চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী খ্রিঃ) ছিল ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয় এবং তারই অংশ হিসেবে গিল্ড বা 'শ্রেণী' (Guild/শ্রেণী/শ্রেণীসংগঠন) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গিল্ডের সংগঠন

সংজ্ঞা ও পরিচিতি:

গিল্ড ছিল একই পেশার কারিগর, ব্যবসায়ী বা শিল্পীদের সংগঠন। সংস্কৃতে এগুলোকে 'শ্রেণী' বলা হত। এই সংগঠনগুলো তাদের সদস্যদের স্বার্থরক্ষা, মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা করত।

গঠনতন্ত্র ও সদস্যপদ:

গিল্ডের নিজস্ব গঠনতন্ত্র ছিল। সদস্য হতে হলে নির্দিষ্ট নিয়ম মানতে হত এবং সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখতে হত। নতুন সদস্যকে গিল্ডের অনুমতি নিয়ে সদস্যপদ নিতে হত।

নেতৃত্ব ও প্রশাসন:

প্রতিটি গিল্ডের একজন বা একাধিক নেতা (জ্যেষ্ঠ/প্রধান/জেঠক) থাকতেন, যাঁরা সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। গিল্ডের নিজস্ব সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল।

অর্থনৈতিক কার্যক্রম:

গিল্ড সদস্যরা যৌথভাবে উৎপাদন, মূল্যনির্ধারণ, পণ্য বিপণন ও বিতরণ করতেন। গিল্ড প্রায়ই রাজা বা প্রশাসনের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা বা স্বীকৃতি পেত। অনেক গিল্ড নিজস্ব তহবিল গঠন করত এবং ঋণ দিত।

আইন ও শৃঙ্খলা:

গিল্ডের নিজস্ব নিয়ম-কানুন ছিল। সদস্যরা নিয়ম ভঙ্গ করলে গিল্ড তাদের শাস্তি দিতে পারত। গিল্ডের সিদ্ধান্ত আদালতেও স্বীকৃত হত।

সামাজিক ও ধর্মীয় ভূমিকা:

গিল্ড শুধু অর্থনৈতিক সংগঠন ছিল না, বরং তারা ধর্মীয় ও সামাজিক কাজেও অংশ নিত, যেমন মন্দির নির্মাণ, দান-ধ্যান ইত্যাদি।

গিল্ডের গুরুত্ব:

গুপ্ত যুগে গিল্ড অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, পেশাগত মানোন্নয়ন, এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাজা ও প্রশাসন গিল্ডের উপর নির্ভর করত এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত।

উপসংহার:

গুপ্ত যুগে গিল্ড বা শ্রেণী ছিল একটি সুসংগঠিত, স্বশাসিত ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা তৎকালীন ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৫.দ্বিতীয় তরাইন যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা:

দ্বিতীয় তরাইন যুদ্ধ (Second Battle of Tarain) ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান হরিয়ানার তরাইন অঞ্চলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দিল্লির চাহমান রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান ও গোর রাজবংশের সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পৃথ্বীরাজ চৌহান এই যুদ্ধে পরাজিত হন এবং মুহাম্মদ ঘোরী উত্তর ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় তরাইন যুদ্ধের গুরুত্ব:

উত্তর ভারতের মুসলিম শাসনের সূচনা:
এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘোরীর বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতে মুসলিম শাসনের পথ প্রশস্ত হয়। এর পরপরই দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা ঘটে, যা ভারতীয় ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

হিন্দু রাজ্যগুলোর পতন:

পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের ফলে উত্তর ভারতের শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যগুলোর পতন শুরু হয় এবং মুসলিম শাসকরা একের পর এক নতুন অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হন।

রাজনৈতিক পরিবর্তন:

এই যুদ্ধের ফলে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। স্থানীয় রাজাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বিদেশি শাসকরা সহজেই ভারত দখল করতে পেরেছিল।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব:

মুসলিম শাসনের সূচনা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন ধারা নিয়ে আসে। নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ভাষা, শিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসে।

প্রশাসনিক পরিবর্তন:

দিল্লি সুলতানির শাসনব্যবস্থা, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন ধারা সূচিত হয়, যা পরবর্তীতে মুঘল যুগেও প্রভাব বিস্তার করে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

দ্বিতীয় তরাইন যুদ্ধ ভারতীয় ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি মধ্যযুগীয় ভারতের সূচনা নির্দেশ করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলে।

উপসংহার:

দ্বিতীয় তরাইন যুদ্ধ শুধু একটি সামরিক সংঘর্ষ ছিল না, বরং এটি ভারতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচিত হয়।

৬.অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞাণ (৯৮২-১০৫৪ খ্রিঃ) ছিলেন মধ্যযুগের বিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক ও ধর্মগুরু। তিনি বাংলাদেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অতীশ দীপঙ্কর নালন্দা ও বিক্রমশিলা মহাবিহারে শিক্ষা লাভ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিব্বতের রাজা আম্ব্রোচা-চো-দে-র আমন্ত্রণে তিনি তিব্বত যান এবং সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান ও বজ্রযান

শাখার প্রচার করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের নতুন যুগের সূচনা হয় এবং তিনি 'অতীশ' নামে বিশেষভাবে সম্মানিত হন।

অতীশ দীপঙ্কর বহু গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে 'বোধিপথপ্রদীপ' (Bodhipathapradipa) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শান্তি, অহিংসা ও মানবকল্যাণের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর অবদান শুধু ভারত ও বাংলাদেশেই নয়, তিব্বত ও চীনের বৌদ্ধ ধর্মেও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

<u>উপসংহার</u>:

অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন একজন যুগান্তকারী বৌদ্ধ চিন্তাবিদ ও ধর্মসংস্কারক, যিনি ভারত ও তিব্বতের
বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

CATEGORY - II / বিভাগ - খ 6x2 =12

৭.গুপ্ত যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা:

গুপ্ত যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি
গুপ্ত যুগ (চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী খ্রিঃ) ভারতীয় ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' নামে পরিচিত। এই সময়ে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ অগ্রগতি সাধিত হয়। বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই যুগের অবদান শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিচে গুপ্ত যুগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতির আলোচনা করা হলো-

<u>১. গণিতের অগ্রগতি</u>

শূন্য ও দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার:
গুপ্ত যুগে ভারতীয় গণিতবিদরা সর্বপ্রথম শূন্য (০) এবং দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। এই আবিষ্কার বিশ্ব গণিতের ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।

<u>আর্যভট্টের অবদান:</u>

বিখ্যাত গণিতবিদ আর্যভট্ট (৪৭৬-৫৫০ খ্রিঃ) তাঁর 'আর্যভটীয়' গ্রন্থে পাই (π)-এর মান নির্ণয়, বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র প্রদান করেন।

বীজগণিত ও জ্যামিতি:

বীজগণিত (Algebra) ও জ্যামিতির (Geometry) বিভিন্ন সূত্র, সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি, এবং গাণিতিক ধাঁধার উন্নয়ন ঘটে।

২. জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি

গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও পৃথিবীর ঘূর্ণন:
আর্যভট্ট প্রথম বলেন যে, পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘূর্ণায়মান এবং সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।

বরাহমিহিরের অবদান:

বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭ খ্রিঃ) তাঁর 'বৃহৎ সংহিতা' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, আবহাওয়া, ঋতুচক্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন।

কাল গণনা ও পঞ্চাঙ্গ:

এই সময়ে সঠিকভাবে দিন, মাস, বছর, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য পঞ্চাঙ্গ (calendar) তৈরি হয়।

৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি

আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা:

গুপ্ত যুগে চরক, শুশ্রুত, বাগভট প্রমুখের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

শল্য চিকিৎসা:

শুশ্রুত সংহিতায় অস্ত্রোপচার, হাড় জোড়া লাগানো, চক্ষু চিকিৎসা, প্লাস্টিক সার্জারি ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

ঔষধ প্রস্তুতি:

বিভিন্ন ভেষজ ও খনিজ ঔষধ ব্যবহারের পদ্ধতি উন্নত হয়। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি আরও বৈজ্ঞানিক হয়।

৪. প্রকৌশল ও স্থাপত্য

মন্দির ও স্থাপত্যশিল্প:

গুপ্ত যুগে উন্নত স্থাপত্যশিল্প ও প্রকৌশল বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দির নির্মাণ, স্তম্ভ, গুহা ইত্যাদিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহৃত হয়।

ভাস্কর্য ও চিত্রকলা:

এই যুগে পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্য, গুহাচিত্র ইত্যাদিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৫. অন্যান্য বিজ্ঞান

জীববিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা:
উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস, ঔষধি গাছের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ:

নদী, পাহাড়, আবহাওয়া, ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায়।

উপসংহার

গুপ্ত যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই যুগের অবদান শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই কারণেই গুপ্ত যুগকে ভারতের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

৮.নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা
ভূমিকা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (Nalanda University) প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ। এটি বর্তমান বিহার রাজ্যের নালন্দা জেলায় অবস্থিত ছিল। গুপ্ত যুগে, বিশেষত

কুমারগুপ্ত (৪১৫-৫৫৫ খ্রিঃ)–এর শাসনামলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় বলে ধারণা করা হয়। প্রায় ৮০০ বছর ধরে এটি জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত ছিল।

প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কুমারগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী শাসকগণ যেমন হর্ষবর্ধন, পাল রাজারা (বিশেষত ধর্মপাল) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নালন্দা শুধু ভারতেই নয়, চীন, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, জাভা, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকেও ছাত্র ও পণ্ডিতরা এখানে পড়তে আসতেন।

শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান হত।

ক. এখানে ১০ হাজারেরও বেশি ছাত্র ও ২ হাজারেরও বেশি শিক্ষক ছিলেন।

খ. শিক্ষাদান ছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরার ভিত্তিতে।

গ. ভর্তি পরীক্ষা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং মেধার ভিত্তিতে ছাত্র নির্বাচন করা হত।

ঘ. পাঠ্যক্রম ছিল উচ্চমানের ও গবেষণাভিত্তিক।

শিক্ষক ও ছাত্র

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন-শীলভদ্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমত, শ্রীসীমহ, বোধিসত্ত্ব, অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ।
বিদেশি ছাত্রদের মধ্যে চীনের হিউয়েন সাঙ (Xuanzang) ও ই-চিং (Yijing) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা নালন্দায় পড়াশোনা করে তাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থাগার ও অবকাঠামো

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশাল গ্রন্থাগার ছিল, যার নাম ছিল “ধর্মগঞ্জ”, “রত্নসাগর”, “রত্নরঞ্জক” ও “রত্নোদধি”। এখানে হাজার হাজার পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল বহু ভবন, অট্টালিকা, পাঠশালা, ছাত্রাবাস, উপাসনালয়, উদ্যান ও জলাশয়ে সমৃদ্ধ। ছয়তলা পর্যন্ত বিশাল গ্রন্থাগার ছিল, যা সে সময়ের স্থাপত্য ও প্রকৌশলের উৎকর্ষের নিদর্শন।

<u>প্রশাসন ও অর্থায়ন</u>

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ও অর্থায়ন রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের অনুদান, জমিদান, দান-ধ্যান ও ছাত্রদের ফি থেকে আসত। রাজারা নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে অনুদান দিতেন।

<u>অবদান ও গুরুত্ব</u>

১. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

২. এখানে উৎপন্ন গবেষণা ও জ্ঞান চীন, তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

৩. এটি বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান শাখার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. নালন্দা ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা হত।

<u>পতন</u>

১২ শতকের শেষদিকে (১১৯৩ খ্রিঃ) তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি নালন্দা আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এর ফলে এই মহান বিদ্যাপীঠের অবসান ঘটে।

<u>উপসংহার</u>

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু প্রাচীন ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এক গৌরবময় শিক্ষাকেন্দ্র। এর অবদান আজও স্মরণীয়। আধুনিক যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে।
নালন্দা প্রমাণ করে, ভারতীয় উপমহাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বনেতৃত্ব দিয়েছে।

৯.শশাঙ্কের কৃতিত্ব

ভূমিকা

শশাঙ্ক (প্রায় ৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ) ছিলেন প্রাচীন বঙ্গের (গৌড়) প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা। তিনি গৌড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর শাসনামলে গৌড় রাজ্য রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

১. স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

শশাঙ্কের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, তিনি গৌড়ে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কিছু অংশ) স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন উত্তর ও পূর্ব ভারত রাজনৈতিকভাবে অস্থির ছিল, তখন শশাঙ্ক দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে গৌড়কে শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

২. সামরিক কৃতিত্ব

উত্তর ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব:
শশাঙ্ক কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন এবং উত্তর ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

হর্ষবর্ধন ও কামরূপের ভাস্করবর্মার বিরুদ্ধে জোট:

শশাঙ্ক কনৌজের রাজা রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন বলে মনে করা হয়। তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন।

রাজ্য বিস্তার:

শশাঙ্ক তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন এবং মগধ, বঙ্গ, উড়িষ্যা, দক্ষিণ বিহার, অঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। এতে গৌড় রাজ্য পূর্ব ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

৩. প্রশাসনিক দক্ষতা

শশাঙ্ক দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি রাজ্য পরিচালনার জন্য সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মুদ্রা প্রচলন, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

৪. ধর্মীয় নীতি ও সংস্কৃতি

হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা:
শশাঙ্ক হিন্দুধর্মের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু শিবমন্দির নির্মাণ করেন এবং শিবপূজার প্রসার ঘটান।

বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধিতা:

কিছু ঐতিহাসিক সূত্রে (বিশেষত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে) শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ আছে। তবে তিনি সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

সংস্কৃতি ও স্থাপত্য:

তাঁর শাসনামলে স্থাপত্য ও মন্দির নির্মাণে অগ্রগতি হয়। গঙ্গার তীরে বহু শিবমন্দির নির্মাণ তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব।

৫. কূটনৈতিক দক্ষতা

শশাঙ্ক দক্ষ কূটনীতিক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা ও শত্রুতা গড়ে তুলে নিজের রাজ্যকে শক্তিশালী করেন। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার বিরুদ্ধে জোট গঠন তাঁর কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়।

৬. ঐতিহাসিক গুরুত্ব

শশাঙ্কের শাসনামল পূর্ব ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। তিনি গৌড় রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীকালে পাল রাজবংশের উত্থানের পথ সুগম করে। তাঁর শাসনকাল পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ও শক্তির প্রতীক।

উপসংহার

শশাঙ্ক ছিলেন পূর্ব ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী শাসক। তিনি শুধু গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও শক্তিশালী শাসকই নন, বরং দক্ষ প্রশাসক, সামরিক নায়ক, কূটনীতিক ও সংস্কৃতিপ্রেমী রাজা হিসেবেও স্মরণীয়। তাঁর কৃতিত্বের জন্যই শশাঙ্ক আজও বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছেন।

১০. চোলদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর আলোচনা

<u>ভূমিকা</u>

চোল রাজবংশ (প্রায় ৯ম থেকে ১৩শ শতাব্দী খ্রিঃ) দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজবংশ। চোলরা দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্য বিখ্যাত। চোল শাসকরা একটি সুসংহত, বিকেন্দ্রীকৃত এবং কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে তাদের সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল।

১. <u>কেন্দ্রীয় প্রশাসন</u>

ক. রাজা ও রাজপরিষদ
চোল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে। রাজা ছিলেন সর্বময় শাসক, সেনাপতি ও প্রধান বিচারক। তাঁকে ‘রাজাধিরাজ’, ‘চক্রবর্তী’ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হত। রাজার সহায়তায় রাজপরিষদ (Ministerial Council) ছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী (মহাসন্ধিবিগ্রহক), সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থাকতেন।

খ. রাজকীয় দপ্তর
প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা যেমন- রাজস্ব, সামরিক, বিচার, ধর্মীয়, গণপূর্ত ইত্যাদি পরিচালনার জন্য পৃথক দপ্তর ছিল। প্রতিটি দপ্তরের প্রধান ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

২. <u>প্রাদেশিক প্রশাসন</u>

ক. মণ্ডল, নাড়ু ও কোট্টম
চোল সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রশাসনিক এককে ভাগ করা হত-

মণ্ডল: বৃহত্তর প্রদেশ বা অঞ্চল

নাড়ু: মণ্ডলের অধীনস্থ ছোট অঞ্চল

কোট্টম বা ভাট্টি: নাড়ুর অধীন আরও ছোট একক

প্রত্যেক স্তরে রাজা নিযুক্ত প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা (যেমন- মণ্ডলাধিপতি, নাড়ুবাড়্য, কোট্টমাধিপতি) প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করতেন।

৩. স্থানীয় প্রশাসন

ক. গ্রাম প্রশাসন
চোলদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রাম প্রশাসন।

সাবা (Sabha): ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত গ্রামে 'সাবা' নামে স্বশাসিত পরিষদ ছিল।

উর (Ur): সাধারণ গ্রামবাসীদের জন্য 'উর' পরিষদ ছিল।

নাগরম (Nagaram): শহর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের জন্য 'নাগরম' পরিষদ ছিল।

এই পরিষদগুলো স্থানীয় প্রশাসন, রাজস্ব আদায়, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নমূলক কাজ, জল ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করত।
পরিষদের সদস্য নির্বাচন ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে-'কুদাভোলাই' (Kudavolai) নামে লটারির মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন করা হত।

৪. রাজস্ব ব্যবস্থা

চোলদের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উন্নত।

ভূমি কর ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। জমির উর্বরতা, উৎপাদন ও আয় অনুসারে কর নির্ধারণ করা হত।

রাজস্ব আদায়ের জন্য পৃথক বিভাগ ছিল এবং স্থানীয় পরিষদ এ কাজে সহায়তা করত।

রাজস্বের অর্থ মন্দির, সেচ, শিক্ষা, সামরিক, প্রশাসনিক খাতে ব্যয় হত।

৫. সামরিক প্রশাসন

চোলদের সামরিক শক্তি ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। স্থল, নৌ ও অশ্ববাহিনী ছিল চোল সেনার প্রধান অংশ। সেনাপতি ও অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তারা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।
চোল নৌবাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিযান পরিচালনায় বিখ্যাত ছিল।

৬. বিচার ব্যবস্থা

চোল শাসকরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিতেন।

রাজা ছিলেন প্রধান বিচারক।

স্থানীয় পরিষদ ও কর্মকর্তারা ছোটখাটো মামলার নিষ্পত্তি করতেন।

কঠোর আইন ও শাস্তির বিধান ছিল, তবে বিচারপ্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ।

৭. ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশাসন

চোল শাসকরা মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজস্ব ও জমি দান করতেন। মন্দির ছিল শুধু ধর্মীয় কেন্দ্র নয়, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রও।
শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে চোলরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন।

উপসংহার

চোলদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল দক্ষ, সুসংগঠিত ও বিকেন্দ্রীকৃত। গ্রাম প্রশাসনে গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজস্ব ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, সামরিক শক্তির সংগঠন, বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয়-সামাজিক উন্নয়নে চোলদের অবদান ভারতীয় প্রশাসনিক ইতিহাসে অনন্য।
চোলদের প্রশাসনিক কাঠামো পরবর্তী যুগের বহু শাসক দ্বারা অনুসৃত হয়েছে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১১.গুপ্তদের পতনের কারণসমূহ: সমালোচনামূলক আলোচনা

ভূমিকা

গুপ্ত সাম্রাজ্য (প্রায় ৩২০–৫৫০ খ্রিঃ) ভারতীয় ইতিহাসে ‘স্বর্ণযুগ’ নামে পরিচিত। চন্দ্রগুপ্ত I, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত II-এর দক্ষ নেতৃত্বে সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের মুখে পড়ে। এ পতনের পেছনে একাধিক রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ দায়ী ছিল।

১. দুর্বল উত্তরাধিকারী ও প্রশাসনিক দুর্বলতা

সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত II-এর পরবর্তী শাসকরা ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য ও অভিজ্ঞতাহীন। তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব ছিল এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজ্য পরিচালনায় শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়।

২. রাজ্য বিভাজন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রদেশে রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হত, যারা পরে স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য হারান।

৩. হূণ আক্রমণ

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারত হূণ বা হুনদের আক্রমণে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হূণদের প্রধান নেতা তোরমাণ ও মিহিরকুল গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানে। এই আক্রমণে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ও প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ে।

৪. অর্থনৈতিক দুর্বলতা

হূণ আক্রমণ, দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ, রাজস্ব আদায়ে দুর্বলতা, কৃষি উৎপাদনে পতন এবং বাণিজ্যের অবনতি অর্থনীতিকে দুর্বল করে তোলে। মুদ্রার মান কমে যায়, শিল্প ও বাণিজ্য সংকুচিত হয়, ফলে রাজকোষ শূন্য হতে শুরু করে।

৫. সামন্ততান্ত্রিকতার বিকাশ

গুপ্ত যুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা (Feudalism) বিকশিত হয়। রাজারা জমি দান করে সামন্তদের শক্তিশালী করে তোলেন। সামন্তরা ক্রমে স্বাধীন হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য হারিয়ে ফেলে। এতে সাম্রাজ্য বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬. বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। স্থানীয় রাজা, জমিদার ও উপজাতীয় নেতা নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করেন। এতে সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট হয়।

৭. প্রশাসনিক ও সামরিক অবক্ষয়

দীর্ঘদিনের শান্তি ও সমৃদ্ধির ফলে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও দক্ষতার অভাব দেখা দেয়। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অব্যবস্থাপনা বেড়ে যায়। সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শত্রুদের মোকাবিলায় অক্ষম হয়।

৮. ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবর্তন

গুপ্ত যুগের শেষদিকে সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়, জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্য বাড়ে। এতে সমাজে অসন্তোষ ও বিভাজন সৃষ্টি হয়, যা সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে।

৯. নেতৃত্বের অভাব ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা

পরবর্তী গুপ্ত শাসকরা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ছিলেন। তাঁরা প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যর্থ হন এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো ছিল বহুমাত্রিক ও আন্তঃসম্পর্কিত। একদিকে যেমন বহিরাগত আক্রমণ ছিল, তেমনি অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও সমানভাবে দায়ী। প্রশাসনিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক সংকট, সামন্ততান্ত্রিকতার বিকাশ ও দুর্বল নেতৃত্ব-এসবই পতনের পথ প্রশস্ত করে।
তবে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ আকস্মিক ছিল না; এটি ছিল দীর্ঘমেয়াদী অবক্ষয়ের ফল।

উপসংহার

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে বহুবিধ কারণ দায়ী ছিল-দুর্বল উত্তরাধিকারী, প্রশাসনিক অবক্ষয়, হূণ আক্রমণ, অর্থনৈতিক সংকট, সামন্ততান্ত্রিকতা, বিদ্রোহ ও নেতৃত্বের অভাব। এই পতন ভারতীয় ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে, যার ফলে উত্তর ও পূর্ব ভারতে একাধিক ছোট ছোট রাজ্য ও শক্তির উত্থান ঘটে।

১২.পালদের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসসমূহ আলোচনা

ভূমিকা

পাল রাজবংশ (প্রায় ৭৫০-১১৬১ খ্রিঃ) ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ। ধর্মপাল, দেবপাল, গোপাল প্রমুখ পাল শাসকদের সময়ে বাংলা, বিহার ও উত্তর

ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পালদের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। এই উৎসগুলো পাল যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার প্রধান উপায়।

১. শিলালিপি (Inscriptions)
পাল যুগের রাজারা বিভিন্ন স্থানে শিলালিপি উৎকীর্ণ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য শিলালিপি-খারোজ শিলালিপি, গয়া শিলালিপি, নালন্দা তাম্রশাসন, রামপাল তাম্রশাসন ইত্যাদি।

এসব শিলালিপি থেকে রাজাদের বংশপরিচয়, রাজ্য বিস্তার, দানপত্র, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

২. তাম্রশাসন (Copper Plate Grants)
পাল যুগে রাজারা জমি দান, গ্রাম দান, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য বহু তাম্রশাসন জারি করতেন।

এই তাম্রশাসন থেকে প্রশাসনিক কাঠামো, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, দাননীতি, গ্রাম প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য তাম্রশাসন-নালন্দা, ঘূস্রাণ, ভল্লাল সেনের তাম্রশাসন ইত্যাদি।

৩. বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ (Accounts of Foreign Travellers)
চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ও ই-চিং পাল যুগে ভারত ভ্রমণ করেন।

তাঁদের বিবরণে পাল যুগের শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, নালন্দা ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

ই-চিং-এর বিবরণে ধর্মপাল ও দেবপালের শাসনকাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা ইত্যাদি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

৪. সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ
পাল যুগে রচিত বিভিন্ন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ যেমন-তিব্বতি ইতিহাস, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, চর্যাপদ ইত্যাদি পাল যুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অবস্থা জানার উৎস।

চর্যাপদ পাল যুগের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

৫. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (Archaeological Sources)
পাল যুগের স্থাপত্য, মূর্তি, মন্দির, বিহার, স্তূপ, মুদ্রা ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে পাল যুগের শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুর, জগদ্দল, ওদন্তপুরী বিহার ইত্যাদি পাল যুগের স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

৬. মুদ্রা (Coins)
পাল রাজাদের প্রচলিত রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা থেকে অর্থনীতি, বাণিজ্য, রাজ্য বিস্তার, শাসকবর্গের নাম ও উপাধি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

মুদ্রার অলংকরণ ও লিপি থেকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তথ্যও জানা যায়।

৭. তিব্বতি ও অন্যান্য বিদেশি সূত্র
তিব্বতি ইতিহাসবিদ তারানাথ ও অন্যান্য তিব্বতি গ্রন্থে পাল রাজাদের শাসন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

আরব ও পার্সিয়ান লেখকদের বিবরণ থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

<u>সমালোচনামূলক মূল্যায়ন</u>

পাল যুগের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য উপরের উৎসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এইসব উৎসের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে-অনেক শিলালিপি ও তাম্রশাসন অসম্পূর্ণ, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে কিছু পক্ষপাতিত্ব বা ভুল থাকতে পারে, এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অনেক কিছুই আজ নষ্ট বা বিলুপ্ত।
তবুও, এই উৎসগুলোর সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাল যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস যথাযথভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

<u>উপসংহার</u>

শিলালিপি, তাম্রশাসন, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ, সাহিত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা ও তিব্বতি সূত্র-এসবই পালদের ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রধান উৎস। এদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাল যুগের গৌরবময় ইতিহাস, শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

CATEGORY - III / বিভাগ **-** গ **12x1 =12**

১৩..গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে মূল্যায়ন

ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ (প্রায় ৩২০ খ্রিঃ-৫৫০ খ্রিঃ) এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে ভারত রাজনৈতিক ঐক্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক স্থিতি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সাক্ষী হয়। এই কারণেই ঐতিহাসিকরা এই যুগকে "প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ" (Golden Age of Ancient India) বলে অভিহিত করেছেন। নিচে এই মূল্যায়নের পক্ষে যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করা হলো-

১. <u>রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতা</u>

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন: চন্দ্রগুপ্ত I, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত II-এর মতো দক্ষ ও পরাক্রমশালী শাসকদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক স্থিতি ও ঐক্য বজায় ছিল।

সাম্রাজ্যের বিস্তার**:** সমুদ্রগুপ্তের সামরিক অভিযানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এক ছাতার নিচে এসেছিল।

প্রশাসনিক দক্ষতা: গুপ্ত প্রশাসন ছিল সংগঠিত, কার্যকর ও তুলনামূলকভাবে ন্যায়বিচারপূর্ণ। রাজস্ব, বিচার, সামরিক ও স্থানীয় প্রশাসনে দক্ষতা ছিল।

২**.** <u>অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি</u>

কৃষি ও বাণিজ্য**:** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, নতুন নতুন জমি চাষের আওতায় আসে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (বিশেষত রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন) বিস্তার লাভ করে।

শিল্প ও কারুশিল্প: বস্ত্র, ধাতু, মৃৎশিল্প, অলংকার, মুদ্রা নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পে অগ্রগতি হয়।

মুদ্রা প্রচলন: সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত হয়, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিচায়ক।

৩. <u>সামাজিক স্থিতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা</u>
<u>সামাজিক শান্তি</u>:

সমাজে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ছিল। চুরি-ডাকাতি কম ছিল, আইন-শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা: হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান ছিল। রাজারা সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। বৌদ্ধ বিহার, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে রাজারা দান করতেন।

৪. <u>শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা</u>

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র: নালন্দা, বিক্রমশিলা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এখানে দেশ-বিদেশের ছাত্র ও পণ্ডিতরা পড়তে আসতেন।

শিক্ষার প্রসার: সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা, শিল্পকলা ইত্যাদিতে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা হত।

৫. <u>সাহিত্য ও ভাষার বিকাশ</u>
<u>সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ</u>:

সংস্কৃত ছিল রাজকীয় ও সাহিত্যিক ভাষা। কবি কালিদাস, ভট্টি, শূদ্রক, বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য), বাণভট্ট প্রমুখ এই যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক।

বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম: ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’, ‘মেঘদূত’, ‘কুমারসম্ভব’, ‘হর্ষচরিত’, ‘মৃচ্ছকটিক’ প্রভৃতি অমর সাহিত্যকর্ম রচিত হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য: পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্য ও দর্শন চর্চা হয়।

৬. <u>শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষ</u>

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য: গুপ্ত যুগে ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যে ক্লাসিক্যাল উৎকর্ষ দেখা যায়। দেবগড়, ভীতারগাঁও, উদয়গিরি, এলোরার গুহা, অজন্তার গুহাচিত্র ইত্যাদি এই যুগের নিদর্শন।

মূর্তি ও অলংকার: গুপ্ত যুগের ব্রোঞ্জ, পাথর ও মৃন্ময় মূর্তি অত্যন্ত নিপুণ ও শৈল্পিক।

চিত্রকলা: অজন্তা গুহার চিত্রকলা এই যুগের শিল্প-ঐতিহ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি

গণিত:

শূন্য (০) ও দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার, পাই (π)-এর মান নির্ণয়, বীজগণিত ও জ্যামিতির উন্নতি (আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ)।

জ্যোতির্বিজ্ঞান: গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, পৃথিবীর ঘূর্ণন, সূর্য-চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

চিকিৎসা: আয়ুর্বেদ, শল্যচিকিৎসা, ভেষজ ও খনিজ ঔষধের ব্যবহার, চরক ও শুশ্রুতের অবদান।

প্রকৌশল: উন্নত স্থাপত্য, জলাধার, সেচব্যবস্থা, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি।

৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিস্তার

বিদেশি পর্যটকদের আগমন: চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, ই-চিং প্রমুখ গুপ্ত যুগে ভারত ভ্রমণ করেন এবং ভারতের শান্তি, সমৃদ্ধি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশংসা করেন।

সংস্কৃতির বিস্তার: গুপ্ত যুগের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্প দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

৯. ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন

ভি. এ. স্মিথ: গুপ্ত যুগকে “Golden Age of Hindu India” বলে অভিহিত করেছেন।

রোমিলা থাপার: এই যুগে সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার যে উৎকর্ষ দেখা যায়, তা ভারতীয় ইতিহাসে বিরল।

আর. সি. মজুমদার: গুপ্ত যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যই একে স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

যদিও গুপ্ত যুগে সমাজে জাতিভেদ, নারীর অবস্থার অবনতি, কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ইত্যাদি সমস্যা ছিল, তবুও সামগ্রিকভাবে এই যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল।

সমাজে স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও শিল্পের উৎকর্ষ, শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা-সব মিলিয়ে এই যুগকে ‘স্বর্ণযুগ’ বলা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার

গুপ্ত যুগে ভারতের যে বহুমুখী উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তা ভারতীয় ইতিহাসে অনন্য। রাজনৈতিক ঐক্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক স্থিতি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষার বিস্ময়কর বিকাশ-সব দিক থেকেই গুপ্ত যুগ ছিল প্রকৃত অর্থে "প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ"।

১৪. উত্তরের অধিপতি' প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের উপর সমালোচনামূলক আলোচনা

ভূমিকা

হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রিঃ) ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট শাসক। তিনি উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং "উত্তরের অধিপতি" (Lord of the North) উপাধিতে ভূষিত হন। হর্ষবর্ধনের শাসনকাল রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাঁর সাম্রাজ্য কতটা সুসংহত ও স্থায়ী ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। নিচে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি, শাসনব্যবস্থা, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনা করা হলো-

১. হর্ষবর্ধনের উত্থান ও 'উত্তরের অধিপতি' উপাধি

রাজ্যাভিষেক ও সাম্রাজ্য বিস্তার:

হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র। ভাই রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমে থানেশ্বর ও কানৌজের রাজা হন, পরে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল একত্রিত করেন।

'উত্তরের অধিপতি' উপাধির তাৎপর্য:

হর্ষবর্ধন নিজেকে 'উত্তরের অধিপতি' (Sakalottarapathanatha) বা 'সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি' বলে ঘোষণা করেন। তিনি গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন।

দক্ষিণ ভারতের প্রতি আগ্রহ:

তিনি দক্ষিণ ভারত জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চালুক্য রাজা পুলকেশিন II-এর কাছে পরাজিত হন। ফলে তাঁর সাম্রাজ্য মূলত উত্তর ও পূর্ব ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

২. প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শাসনকৌশল
কেন্দ্রীয় শাসন:

হর্ষবর্ধন প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণে গুরুত্ব দেন। তিনি নিজে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর সভায় দক্ষ মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারক ও রাজপুরোহিত ছিলেন।

প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসন:

রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করা হত, প্রতিটির শাসনভার ছিল রাজা নিযুক্ত গভর্নরের হাতে। স্থানীয় প্রশাসনে গ্রাম ও শহর পরিষদের ভূমিকা ছিল।

রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা:

ভূমি কর ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার বজায় রাখার চেষ্টা করা হত।

৩. সামরিক শক্তি ও কূটনীতি
সামরিক অভিযান:

হর্ষবর্ধন তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারে একাধিক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি পাঞ্জাব, সিন্ধু, মগধ, বঙ্গ, কামরূপ ইত্যাদি অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

দক্ষিণ ভারত অভিযান ও ব্যর্থতা:
চালুক্য পুলকেশিন II-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন, যার ফলে তাঁর সাম্রাজ্য দক্ষিণে বিস্তৃত হতে পারেনি।

কূটনৈতিক সম্পর্ক:

তিনি নেপাল, কামরূপ, চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। চীনা সম্রাটের সঙ্গে দূতাবিনিময় করেন।

৪. ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি
ধর্মীয় সহিষ্ণুতা:

হর্ষবর্ধন নিজে শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন এবং বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের সমান সম্মান দিতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি:

হর্ষবর্ধন পণ্ডিত ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত কবি বাণভট্ট, ধর্মশীল, হিউয়েন সাঙ প্রমুখ তাঁর সভায় ছিলেন। তিনি নিজেও 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক রচনা করেন।

সমাজকল্যাণ:

তিনি দরিদ্র, অসহায়, রোগী, ভিক্ষুকদের জন্য দান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। প্রতি পাঁচ বছরে 'প্রয়াগ'–এ মহাদান উৎসবের আয়োজন করতেন।

৫. <u>হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা</u>

সাম্রাজ্যের প্রকৃতি:
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ছিল মূলত সামরিক আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত, প্রশাসনিক ঐক্য ও সংহতি তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল। অনেক রাজ্য ছিল তাঁর অধীনস্থ (feudatory), কিন্তু তারা স্বাধীনতার স্বাদ পেত।

স্থায়িত্বের অভাব:

তাঁর মৃত্যুর পর কোনো শক্তিশালী উত্তরাধিকারী না থাকায় সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে। স্থানীয় রাজারা পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

দক্ষিণে ব্যর্থতা:

দক্ষিণ ভারত জয় করতে না পারায় তাঁর সাম্রাজ্য সর্বভারতীয় রূপ পায়নি।

সামাজিক বৈষম্য ও জাতিভেদ:
সমাজে জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব ছিল। নারীর অবস্থার উন্নতি হয়নি।

অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা:
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষি ও বাণিজ্যের কিছু উন্নতি হলেও, রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক দক্ষতায় গুপ্ত যুগের মতো উৎকর্ষ ছিল না।

৬. ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন
হিউয়েন সাঙের বিবরণ:

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের শাসনকালকে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যুগ বলে বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি:

অনেকে মনে করেন, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ছিল সামরিক আধিপত্যনির্ভর এবং প্রশাসনিক সংহতি দুর্বল ছিল। তাঁর শাসনকাল ছিল এক ধরনের 'রাজনৈতিক অন্তর্বর্তীকাল'-গুপ্ত যুগের পতন ও পাল-প্রতিহর-রাষ্ট্রকূটদের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়।

উপসংহার

হর্ষবর্ধন ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম প্রতিভাবান ও কর্মঠ শাসক। তিনি "উত্তরের অধিপতি" হিসেবে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তবে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল মূলত সামরিক আধিপত্যনির্ভর, প্রশাসনিক সংহতি ও স্থায়িত্বের অভাব ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে। তবুও, হর্ষবর্ধনের শাসনকাল মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনন্য অবদান রেখেছে।

১৫.ধর্মপালের কৃতিত্ব

ভূমিকা

ধর্মপাল (প্রায় ৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) পাল রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রতাপশালী শাসক। তিনি গোপালের পুত্র এবং পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা। তাঁর শাসনকালে পাল সাম্রাজ্য রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ও বিস্তার লাভ করে। ধর্মপালের যুগকে পাল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

১. সাম্রাজ্য বিস্তার ও রাজনৈতিক সাফল্য
উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল জয়:

ধর্মপাল তাঁর সামরিক কৃতিত্বের জন্য বিখ্যাত। তিনি মগধ, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অসম, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

কনৌজের অধিপতি:

কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসনে নিজের পছন্দের রাজা চক্রায়ুধকে বসান। ফলে তিনি "উত্তর ভারতের অধিপতি" হিসেবে স্বীকৃতি পান।

বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে জোট ও কূটনীতি:

তিনি রাজপুত, গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজবংশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং প্রয়োজনে সামরিক জোট গড়ে তোলেন।

২. প্রশাসনিক দক্ষতা
সুশৃঙ্খল প্রশাসন:

ধর্মপাল দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি রাজ্য পরিচালনায় দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ, রাজস্ব আদায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটান।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা:

জমি জরিপ ও ভূমি কর আদায়ের জন্য আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

স্থানীয় প্রশাসন:

গ্রাম ও শহর পর্যায়ে স্বশাসিত পরিষদ গঠন করেন, যা প্রশাসনকে আরও কার্যকর করে তোলে।

৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা
বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা:

ধর্মপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
তিনি বিক্রমশিলা মহাবিহার (বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন, যা বৌদ্ধ শিক্ষা ও গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা:

ধর্মপাল মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু বিহার, স্তূপ, মন্দির ও শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করেন।

বিদেশি ছাত্র ও পণ্ডিতদের আকর্ষণ:

তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চীন, তিব্বত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, জাভা প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্র ও পণ্ডিতরা বাংলায় আসতেন।

৪. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবদান
ধর্মীয় সহিষ্ণুতা:

যদিও তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তবুও হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন।

শিল্প ও স্থাপত্য:

ধর্মপালের শাসনকালে পাল স্থাপত্য, মূর্তি নির্মাণ, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিক্রমশিলা, সোমপুর, জগদ্দল, ওদন্তপুরী বিহার এই যুগের স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

৫. আন্তর্জাতিক খ্যাতি
বৈদেশিক সম্পর্ক:

ধর্মপালের শাসনকালে পাল সাম্রাজ্যের খ্যাতি চীন, তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ:

চীনা পরিব্রাজক ই-চিং তাঁর শাসনকাল ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রশংসা করেছেন।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

ধর্মপালের শাসনকাল ছিল পাল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখর। সাম্রাজ্য বিস্তার, প্রশাসনিক দক্ষতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। তবে, তাঁর শাসনকালেও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব চলমান ছিল এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। তবুও, সামগ্রিকভাবে ধর্মপাল ছিলেন এক অসাধারণ শাসক, যাঁর অবদান বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

উপসংহার

ধর্মপাল ছিলেন পাল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার, প্রশাসনিক দক্ষতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বাংলাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেন। তাঁর যুগে পাল সাম্রাজ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল।
তাই ধর্মপালের কৃতিত্ব ভারতীয় তথা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

১৬.পালদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

<u>ভূমিকা</u>

পাল রাজবংশ (প্রায় ৭৫০–১১৬১ খ্রিঃ) ছিল বাংলার ইতিহাসে প্রথম বৃহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য। গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রমুখ পাল শাসকদের দক্ষ নেতৃত্বে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল একত্রিত হয়েছিল। পাল যুগে প্রশাসনিক দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক অনন্য যুগ সূচিত হয়। নিচে পালদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিশদ আলোচনা করা হলো-

<u>১. পালদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড</u>

ক. রাজতান্ত্রিক শাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন
পাল সাম্রাজ্য ছিল এককেন্দ্রিক রাজতন্ত্র। রাজা ছিলেন সর্বময় শাসক, সেনাপতি ও প্রধান বিচারক।

রাজা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধারণ করতেন, তবে দক্ষ মন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা সহায়তা পেতেন।

রাজসভা ছিল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেন্দ্র, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ হত।

খ. প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসন
সাম্রাজ্যকে ‘ভুক্তি’ (প্রদেশ), ‘মণ্ডল’ (জেলা), ‘বিশয়’ (উপজেলা), ‘গ্রাম’-এইভাবে বিভক্ত করা হত।

প্রতিটি স্তরে রাজা নিযুক্ত গভর্নর, বিশয়পতি, গ্রামপ্রধান ইত্যাদি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

স্থানীয় প্রশাসনে স্বশাসিত গ্রাম পরিষদ (গ্রামসভা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

রাজস্ব আদায়, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, কৃষি উন্নয়ন, জল ব্যবস্থাপনা, সেচ ইত্যাদি প্রশাসনিক কাজ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হত।

গ. রাজস্ব ও অর্থনৈতিক প্রশাসন
রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমি কর। জমির উর্বরতা ও উৎপাদন অনুসারে কর নির্ধারণ করা হত।

রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতা ও কঠোরতা বজায় রাখা হত। জমি জরিপ, ভূমি দান, তাম্রশাসন ইত্যাদি ছিল প্রশাসনিক নিয়মের অংশ।

রাজস্বের অর্থ মন্দির, বিহার, শিক্ষা, সামরিক, প্রশাসনিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হত।

ঘ. সামরিক প্রশাসন
পাল রাজাদের শক্তিশালী স্থল এবং অশ্ববাহিনী ছিল।

সেনাপতি ও অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তারা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

সাম্রাজ্য রক্ষায় ও সম্প্রসারণে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

দুর্গ, প্রহরা, সীমান্ত রক্ষা ও বিদ্রোহ দমন প্রশাসনের অংশ ছিল।

ঙ. বিচার ও আইন ব্যবস্থা
রাজা ছিলেন প্রধান বিচারক।

স্থানীয় আদালত ও গ্রামসভা ছোটখাটো মামলার নিষ্পত্তি করত।

আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল, তবে ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণে গুরুত্ব দেওয়া হত।

চ. প্রশাসনিক দলিল ও শিলালিপি
প্রশাসনিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও স্মারক হিসেবে বহু শিলালিপি, তাম্রশাসন ও দানপত্র সংরক্ষিত হয়েছে, যা পাল প্রশাসনের গুণগত মান ও দক্ষতার স্বাক্ষর।

২. পালদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

ক. শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা
পাল যুগে শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুর, জগদ্দল, ওদন্তপুরী, বিক্রমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশ-বিদেশের ছাত্র ও পণ্ডিতরা এখানে পড়তে আসতেন।

দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা হত।

খ. সাহিত্য ও ভাষার বিকাশ
পাল যুগে সংস্কৃত, পালি ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা হয়।

চর্যাপদ পাল যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, শিলালিপি ইত্যাদি সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে পালদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

গ. ধর্ম ও দর্শনের প্রসার
পাল রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তবে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সহিষ্ণু ছিলেন।

বহু বিহার, স্তূপ, মন্দির, ধর্মশালা নির্মিত হয়।

পাল যুগে বৌদ্ধ দর্শনের নানা শাখা ও উপশাখার বিকাশ ঘটে।

তিব্বত, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে।

ঘ. শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
পাল যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এক নতুন ধারার সূচনা হয়, যাকে “পাল শিল্প” বলা হয়।

সোমপুর, বিক্রমশিলা, নালন্দা, জগদ্দল বিহার, মন্দির, স্তূপ, চৈত্য, প্রাসাদ, গেটওয়ে ইত্যাদি নির্মাণে বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখা যায়।

পাথর, ব্রোঞ্জ, মাটি ও ধাতুর মূর্তি নির্মাণে পাল শিল্পীরা বিশ্বখ্যাত ছিলেন।

পাল যুগের শিল্প-স্থাপত্য তিব্বত, নেপাল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পধারায় গভীর প্রভাব ফেলে।

ঙ. আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
পাল যুগে চীন, তিব্বত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদান-প্রদান হয়।

চীনা পরিব্রাজক ই-চিং, তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথ প্রমুখ পাল যুগের শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশংসা করেছেন।

৩. <u>সমালোচনামূলক মূল্যায়ন</u>
<u>প্রশাসনিক দক্ষতা:</u>

পাল রাজারা দক্ষ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, রাজস্ব, সামরিক শক্তি ও স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ:

শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, স্থাপত্য-সব ক্ষেত্রেই পাল যুগ ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও আন্তর্জাতিকতা:

পাল যুগে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, বহুজাতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জিত হয়েছিল।

<u>সীমাবদ্ধতা</u>:

সাম্রাজ্যের শেষদিকে প্রশাসনিক দুর্বলতা, সামন্ততান্ত্রিকতা ও বহিরাগত আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তবুও, পাল যুগের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক অবদান অনস্বীকার্য।

<u>উপসংহার</u>

পাল রাজারা দক্ষ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, রাজস্ব, সামরিক শক্তি ও স্থানীয় স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাশাপাশি শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

তাই পালদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এবং অনন্য। এই যুগকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যথার্থ।